মুঘল সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের ইতিহাস

[দ্বিতীয় খণ্ড]

অনিরুদ্ধ রায়
প্রাক্তন অধ্যাপক
ইসলামি ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

পরিবেশক
মিত্রম্
৩৭এ, কলেজ স্ট্রীট ঃঃ কলকাতা-৭৩

প্রগতিশীল প্রকাশক
৩৭এ, কলেজ স্ট্রীট ঃঃ কলকাতা-৭৩

Scanned with CamScanner

মুঘল স্থাপত্য

১৫২৬ সালে বাবর মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করলেও, ১৫৪০ সালে শের শাহ শূর দিল্লির সিংহাসন দখল করেন। পনেরো বছর ধরে শূর বংশ রাজত্ব করার পর হুমায়ুন আবার মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। স্বল্প সময়ের জন্য হলেও শের শাহের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব স্থাপত্যে ছাপ রেখে গিয়েছে। ওঁর স্থাপত্য ধারাকে লোদী স্থাপত্য বলে ধরা হয়।

Scanned with CamScanner

সাসারামে শের শাহ যে সমাধিসৌধ করেছিলেন তার মধ্যে শাসক পরিবারের তিনটি সমাধি আছে ও অন্য একটি স্থপতির যিনি এটি তৈরি করেছিলেন। আর একটি সমাধি আছে কিছুদুরে বক্তিয়ার খান নামে এক অভিজাতের। সবগুলিই সম্ভবত করা হয়েছিল শের শাহ সম্রাট হবার আগে। সাসারামে যে সজীবতা দেখা যায় সমকালীন দিল্লির সমাধি সৌধগুলিতে তা পাওয়া যায় না। শের শাহ আলিওয়ার খান নামে এক ওস্তাদ স্থপতিকে দিয়ে এই কাজ করান, যিনি রাজকীয় ধরনে একাজ করেছিলেন। সম্ভবত ১৫৩৫ সাল নাগাদ উনি সাসারামে শের শাহের বাবা, হাসান খানের সমাধি করেছিলেন।

পাঁচিল দিয়ে ঘেরা সাসারামের সমাধি সৌধটি অষ্টকোণাকৃতি লোদী সমাধিগুলির ধরনে করা। কিন্তু ঐগুলির চাইতে এর স্থাপত্য সৌন্দর্য অনেক বেশি। প্রথমত, এটি জমির থেকে সোজা উঠে গিয়েছে—অর্থাৎ এর কোন মূল ভিত্তি ভূমি (Plinth) নেই, যার ফলে দৃশ্যত এর সৌন্দর্য কিছু কমেছে। দ্বিতীয়ত এর মাঝের তলা ফাঁকা। পূর্ববর্তী কোন সমাধির মত এর পাথরের পর্দা বা অন্য কিছু নেই। তৃতীয়ত, অন্যান্য লোদী সমাধিগুলি মূলত অনুসরণ করলেও, এটি ঐগুলির থেকে আলাদা। সাধারণ যে কোন লোদী সমাধির থেকে এটি আয়তনে অনেক বড়। এটি চওড়ায় প্রায় ২৫০ ফুট ও অন্যান্য সমাধির থেকে এর তলার সংখ্যা বেশি। পিরামিড ধরনের পাঁচটি আলাদা স্তর দিয়ে এটি রয়েছে প্রায় ১৫০ ফুট অবধি উঁচু। একটা হ্রদের সামনে বসানো এর এক-একটা ধার প্রায় ১৪০০ ফুট। পাকাপোক্তভাবে তৈরি হলেও দূর থেকে মনে হয় যে এটি জলের উপর ভাসছে। বাইরের জগতের সঙ্গে এর যোগ রয়েছে একটা জলের উপর সেতুরাস্তার মধ্য দিয়ে যেটি হ্রদের উত্তর পাড়ের রক্ষীদের ঘর দিয়ে ভিতরে চলে গিয়েছে। এটা বন্ধ করে দিলে ভিতরে আসা ঠেকানো যায়। পাঁচটা তলার মধ্যে দুটি তলা সোজা জলের উপরকার তলা যেগুলি সৌধটির মূল আধার হিসাবে কাজ করছে। এর উপরে একটা বড় চৌকো ছাদ এমনভাবে করা হয়েছে যে এটা একটা বড় উঠান হিসাবে কাজ করে যার দুকোণায় স্তম্ভযুক্ত দুটি ছত্রী রয়েছে। এই বড় উঠানের মধ্যে রয়েছে অষ্টকোণা তিনস্তরে বিভক্ত সমাধিসৌধ যার উপরে নীচু কিন্তু চওড়া গম্বুজ রয়েছে। নীচুর স্তরটি একটা বারান্দার মত যার আটকোণার প্রতিটিতে তিনটি করে খিলান রয়েছে। দ্বিতীয় স্তরটি সাদাসিধা দেয়াল, হাসানের সমাধির মত, কিন্তু এর প্রতিটি কোণায় একটা স্তম্ভযুক্ত ছত্রী রয়েছে। মধ্যে বাইরে বের করা জানালা রয়েছে। আসলে তৃতীয় স্তরটি গম্বুজের ড্রাম। উপরে একটা বিরাট বড় পদ্ম ফুল মুকুটের মত রয়েছে। এটি দেখতে সরল কিন্তু এর বিভিন্ন অংশ জোড়া দেওয়া হয়েছে নিপুণ-ভাবে। এর ক্রমশ ছোট হয়ে যাওয়া স্তরগুলি এবং চৌকো থেকে অষ্টকোণে পরিবর্তন একে একটা সৌন্দর্য দান করেছে।

সমাধিঘরের ভিতরে পশ্চিমদিকে মিহরাব থাকায় দরজা নেই—অন্য দিকগুলিতে দরজা আছে। একটিমাত্র গম্বুজ থাকায়, মাটির থেকে ছাদ প্রায় ৯০ ফুট উঁচুতে। চওড়ায় এটি ৬৬ ফুট। যেহেতু এর বাইরের জমিটি অষ্টকোণ, ভিতরের অংশগুলিতে খিলানগুলি

Scanned with CamScanner

একে বিজাপুরের চতুষ্কোণ গোলগম্বুজের মত চেহারা দিয়েছে। এর ফলে এটিকে পরিবর্তনের কাল বলে ধরা যায়। আটটা দিক থেকে এটি একটা গোলাকার বৃত্তে পরিবর্তিত হয়েছে। এটি করা সম্ভব হয়েছিল বরগা ও ব্রাকেটের সাহায্যে। ভিতরের দেয়ালে একের উপর লাগানো তিন সারির খিলান রয়েছে। উপরে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সারির সংখ্যা কমে যায়। কিন্তু খিলানের সংখ্যা বাড়ে। প্রত্যেকটি কোণই একটা চৌকাঠ দিয়ে লাগানো। এর কিবলার দেওয়ালে শিলালেখ রয়েছে।

চূণার থেকে বালুপাথর নিয়ে এটা তৈরি করা হয়েছিল। এর বাইরের দেওয়ালে রং করা ছিল যার চিহ্ন পাওয়া যায় হলুদ, লাল, নীল ও সাদা রঙের চিহ্ন থেকে। দূর থেকে এর প্রতিসাম্য বোঝা গেলেও দেখা যায় যে এর উপরের অংশটি নীচের স্তরের থেকে একটা বিশেষ কোণ করে করা। সম্ভবত এর কারণ হচ্ছে যে করার সময়ে একটা ভুলের ফলে এইরকম করতে হয়েছিল। মনে হয় তৈরি করার প্রথমদিকে উদ্দেশ্য ছিল যে সমাধি সৌধটিকে জলের উপর তৈরি করা। অর্থাৎ নৌকা করে যাওয়া যাবে। এর চারদিকের সিঁড়ি জলের ধারে চলে গিয়েছে যাতে নৌকা থেকে উঠে আসা যায়। পরবর্তীকালে জলের উপর রাস্তা করে দিয়ে ঐ ব্যবস্থা বাতিল করা হয়েছিল। কিন্তু ঐ রাস্তাটি ভেঙে যাবার ফলে আসল উদ্দেশ্য কি ছিল বোঝা শক্ত। এই ধরনের ব্যবস্থা শের শাহের ছেলে সলীমের সাসারামে আর একটি সমাধিতে দেখা যায় যেটি বড় একটা কৃত্রিম হ্রদের মধ্যে অবস্থিত। সলীম শাহ ১৫৫২ সালে মারা যান এবং ওঁর সমাধিটি এই বংশের শেষ স্থাপত্য কীর্তি।

দিল্লির সিংহাসনে বসার পরই শের শাহ *পুরানা কিল্লা* শুরু করেন। চারপাশে দেয়াল দিয়ে ঘেরা একটা দুর্গের আশপাশ দিয়ে শের শাহ তাঁর রাজধানী বসানোর উদ্যোগ নিলেন, যাকে দিল্লির ষষ্ঠ শহর বলে ধরা হয়। দুটি আলাদা দরজা ছাড়া এই শহরের আর কিছু নেই। ওঁর অকাল মৃত্যুর ফলে শহরটি গড়ে উঠতে পারেনি। দুর্গের মধ্যে একটা মসজিদ ছাড়া আর কিছু নেই। সম্ভবত ১৫৫০ সালে হুমায়ুন ক্ষমতা দখল করে এর প্রাসাদ ও অন্যান্য সৌধ ভেঙে ফেলেন। বাইরের দরজাগুলো লাল বালুপাথরের সঙ্গে মার্বেল পাথর মিলিয়ে করা হয়েছিল সুন্দরভাবে। কিন্তু বাইরের দেওয়াল শক্ত হলেও পাথরের নয়—চুন-শুরকী ও ভাঙা ইঁট দিয়ে তৈরি।

দুর্গের ভিতরে *কিল্লা-ই কুনহা* মসজিদ শের শাহ তৈরি করেছিলেন ১৫৪২ সালে। এর স্থাপত্যের সঙ্গে পনেরো বছর আগে তৈরি জামালা মসজিদের মিল আছে। দুটোরই বাইরের দেয়ালে পাঁচটি খিলানযুক্ত দরজা দেখা যায়। এর মধ্যেরটি একটি খিলানের মধ্য দিয়ে ভিতরে বসানো যার মধ্যে অষ্টকোণ উঠান রয়েছে। এর পিছন থেকে একটি লোদী গম্বুজ উঠে গিয়েছে। ভিতরের অংশ লম্বা একটা হল ঘরের মত যেটি পাঁচভাগে ভাগ করা হয়েছে আড়াআড়ি খিলান দিয়ে। কিবলার দেয়ালে এটাই আবার দেখা যায় তোরণ-শ্রেণী তৈরির মধ্যে।

Scanned with CamScanner

শেহ শাহের রাজকীয় *কিল্লা-ই কুনহা* মসজিদ সাধারণ মসজিদের ধরনে তৈরি। এটি লম্বায় ১৫৮ ফুট, চওড়াতে ৪৫ ফুট এবং উচ্চতায় ৬৬ ফুট। এর দুপাশে ও পিছনে বাইরে বের করা জানালা ও বারান্দা। উত্তর ও দক্ষিণে রাজার পরিবারের ব্যবহার করার জন্য সিঁড়ি রয়েছে। কিন্তু এর প্রধান বৈশিষ্ট্য ও সৌন্দর্য হল এর বাইরের সামনের অংশ যার পাঁচটি খিলানের কথা আগেই বলা হয়েছে। এর মধ্যে কুতুবমিনার ও তুঘলকাবাদ-এর সময়কার ধরন ব্যবহার করা হয়েছে। খিলানের উঁচুদিকে যাবার পথে খিলানগুলি যে বাঁকা হয়ে আসছে, সেটিও নূতন। পরবর্তীকালে মুঘলদের সময়ে এটিই চতুষ্কোণ খিলানে পরিবর্তিত হয়।

ঝিলামের বারো মাইল উত্তর-পশ্চিমে রোটাসে শের শাহ একটা শক্ত দুর্গ তৈরি করেছিলেন সামরিক প্রয়োজনে। বারোটি দরজা লাগানো দুর্গটির দেয়াল ছিল ত্রিশ থেকে চল্লিশ ফুট চওড়া পাথরের। দক্ষিণ-পশ্চিমের সোহাল দরজা এখনো অবিকৃতভাবে আছে। সাত ফুট উঁচু এই দরজাটি খিলানের ভিতরে রয়েছে এবং দুপাশে ছোট জানালা বেরিয়ে আছে।

এসব থেকে বোঝা যায় যে স্থাপত্য সম্পর্কে শের শাহ ভালো ধারণা পোষণ করতেন। অকস্মাৎ মৃত্যু হবার ফলে ওঁর উচ্চ ধারণা প্রকাশ পায়নি।

বাবর ও হুমায়ুন

মুঘলদের প্রথমদিকে রাজনৈতিক অস্থিরতার জন্য বেশি কিছু না করতে পারলেও ধীরে ধীরে একটা রাজকীয় ঘরানা গড়ে উঠতে থাকে। বিভিন্ন প্রদেশে স্থানীয় প্রভাবে এর কিছুটা পরিবর্তন করা হয়। রাজকীয় উৎসাহে এগুলি তৈরি হয়েছিল এবং এর জন্য পাঁচজন মুঘল শাসকের পছন্দ প্রধানত দায়ী। মুঘল স্থাপত্যকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমটি বাবর থেকে আকবরের শেষপর্যন্ত যখন লাল বালুপাথর ব্যবহার করা হয়েছিল। দ্বিতীয়টি শাহজাহানের শেষ সময় অবধি যখন সাদা মার্বেল পাথর খুব বেশি পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

মুঘল স্থাপত্য তার প্রধান রূপ আকবরের সময়ে নিলেও বাবর ও হুমায়ুনের সময়ে এর নিয়মগুলি তৈরি হয়ে গিয়েছিল। বাবর তাঁর আত্মজীবনীতে অনেকগুলি বাগান তৈরি করার কথা বলে গিয়েছেন, যদিও একটি বাদে তার কোনটাই আর নেই। ওঁর সময়কার দুটি মসজিদ রয়েছে একটি পানিপথের কাবুলি বাগে ও অন্যটি দিল্লির পূর্বে সম্ভল শহরের জামা মসজিদ। ১৫২৬ সালে দুটিই তৈরি করা হয়। এগুলির মধ্যে কোন বৈশিষ্ট্য নেই। আর একটি মসজিদ উনি আগ্রার পুরানো লোদী দুর্গের মধ্যে সম্ভবত করিয়েছিলেন। এটি তাঁর পছন্দসই ছিল না এবং বলছেন যে এটি হিন্দুস্থানী সৌধ-এর ধরনে করা। স্থানীয় কারিগরদের নৈপুণ্য সম্পর্কে বাবরের অবশ্য উচ্চ ধারণা ছিল। যেটি তিনি অপছন্দ করতেন সেটি হল স্থানীয় সৌধগুলির পরিকল্পনাবিহীন ও সমতাবিহীনভাবে তৈরি করার পদ্ধতি। বিখ্যাত আলবানিয়ান ওস্তাদ স্থপতি সিনানের কয়েকটি ছাত্রকে বাবর আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। সম্ভবত তারা আসেনি, কারণ মুঘল স্থাপত্যে পারসীক প্রভাবই পাওয়া যায়, তুর্কি ছাপ প্রায় নেই।

Scanned with CamScanner

বাবরের মত হুমায়ুনের প্রভাব মুঘল স্থাপত্যে বিশেষ পড়েনি। পারস্যে চলে যাবার আগে তিনি দুটি মসজিদ তৈরি করেছিলেন আগ্রার কাছে এবং ফতেহাবাদে (হিসার)। এদের অবশ্য কোন বৈশিষ্ট্য নেই বা মুঘল স্থাপত্যে প্রভাব ফেলেনি। কিন্তু প্রায় পনেরো বছর প্রধানত পারস্যদেশে কাটানোর পর যখন তিনি দেশে ফিরলেন তখন নিয়ে এসেছিলেন পারসীক পরম্পরা। এই পরম্পরা তাঁর জীবদ্দশায় বিকশিত হয়নি, বরঞ্চ ওঁর মৃত্যুর পর দেখতে পাওয়া যায়।

দিল্লিতে হুমায়ুনের সমাধিসৌধ মুঘল স্থাপত্য ঘরানার একটা গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন, কিন্তু এর পরম্পরা বহুদিন পরে মুঘল স্থাপত্য জগতে প্রবেশ করেছিল। সমাধিটি হুমায়ুনের মৃত্যুর আট বছর পরে শুরু হয় ১৫৬৪ সালে যেটা বিস্ময়কর। সাধারণত শাসকদের জীবদ্দশাতে সমাধি তৈরি করা হত। সমাধিটি তৈরি করেন ওঁর বিধবা স্ত্রী হাজী বেগম। জায়গাটি বেছে নেওয়া হয়েছিল হুমায়ুনের তৈরি শহর *দীনপণার* কাছে। ঐ শহরের কোন অস্তিত্ব এখন আর পাওয়া যায় না। হুমায়ুনের মৃত্যুর পর দিল্লির জৌলুস কমে গিয়েছিল কারণ আকবর অন্য জায়গায় দরবার বসিয়েছিলেন। যখন সমাধি করা হয়, তখন দিল্লি ছিল প্রায় মৃত শহর, যেখানে প্রাক্তন রাজরাজড়ার কবর রয়েছে।

বেগম সাহেবা সম্ভবত পারসীক পরম্পরা ও ওস্তাদের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। উনি মিরক মীর্জা গিয়াস নামে এক পারসীককে ওস্তাদ হিসাবে মনোনীত করেন, যার ফলে এই সমাধিসৌধতে পারসীক ও ভারতীয় ধারণার সংমিশ্রণ দেখা যায়।

একটা বিশাল বাগানের মাঝখানে সমাধিটি তৈরি করা হয়। লোদীদের শেষদিকে এ দৃশ্য দেখা গেলেও এটা ছিল অনেক বড় মাপের। এরপর চারকোণায় চারটি বিশাল দরজা করা হল। পশ্চিমের দরজাটি ছিল এর প্রধান প্রবেশপথ। বাগানটি মুঘল বাগানের নিয়মানুযায়ী চতুষ্কোণ ও অষ্টকোণ করে ফুল ও পাতার মিশ্রণে করা যেটি সমাধিসৌধের ধরনের সঙ্গে মিশে যায়। মুখ্য সৌধটি একটা বড় ও চওড়া বালুপাথরের চাতালের মধ্যে বসানো। চার-পাশেই খিলানযুক্ত তোরণশ্রেণী ও প্রতিটির মধ্যে দিয়ে ঢুকলে ঘরে পৌঁছানো যায়। এই চাতালের মাঝখানে সমাধিটি রয়েছে। চতুষ্কোণ সৌধটির পাশগুলি ১৫৬ ফুট এবং একই ধরনের। প্রত্যেকটির সামনে একটা জায়গা আছে যার দুপাশে খিলানযুক্ত ঘরের মত রয়েছে। উপরে সুন্দর মার্বেল পাথরের গম্বুজ যার উচ্চতা ১৪০ ফুট এবং যার সঙ্গে রয়েছে স্তম্ভযুক্ত ছত্রী। সমাধির ঘরটি অনেকগুলি ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত। মাঝেরটা সম্রাটের এবং পাশের ছোটগুলিতে পরিবারের লোকজনদের। প্রতিটি ঘরই অষ্টকোণ এবং সব ঘরগুলিতে যাবার ছোট পথ আছে কোণাকুণি করে। জাফরীকাটা জানালার মধ্য দিয়ে আলো আসার ব্যবস্থা রয়েছে।

প্রধানত লাল বালুপাথরের সঙ্গে সাদা মার্বেল পাথর লাগিয়ে অপূর্ব সৌন্দর্যের সৃষ্টি করা হয়েছে। এই সৌধটির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে গম্বুজের দুটো খোলসের ব্যবহার। বাইরের খোলসে রয়েছে সাদা মার্বেল পাথরের ঢাকনা। এর পর কিছু জায়গা ছেড়ে রয়েছে লাল

Scanned with CamScanner

বালুপাথরের গম্বুজ ভিতরের খোলসে। এই ভিতরের খোলসটির গম্বুজ ঘরের ভিতরের ছাদ থেকে উঠে গিয়েছে যার ফলে এটি আরম্ভ হচ্ছে অনেক নীচু থেকে। কিন্তু বাইরের সাদা মার্বেল দেখলে মনে হয় না এটি এত নীচু থেকে শুরু হয়েছিল। এই ধরনের স্থাপত্য পশ্চিম এশিয়াতে তখন হচ্ছিল যার থেকে বোঝা যায় যে ওস্তাদের পারসীক স্থাপত্যবিদ্যার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল।

দিল্লিতে ঐ সময়ে আর একটি ছোট সমাধিসৌধ তৈরি হয়েছিল, সেটি ছিল আতকা খানের। উনি ১৫৬২ সালে নিহত হন। এটি ছিল নিজামুদ্দিন আউলিয়ার দরগার সৌধসমষ্টির মধ্যে। এটি ছোট হলেও এরমধ্যে রঙীন মার্বেল পাথর বসানো হয়েছিল এবং দেয়ালে নানা ভাস্কর্য্য করা হয়েছিল, যেটি মুঘল যুগের সমাধিসৌধ তৈরির আর এক অগ্রবর্তী পর্যায়। সম্ভবত একই কারিগর করেছিল। কিন্তু এখানে তারা কাজ করার স্বাধীনতা বেশি পেয়েছিল।

আকবর

১৫৬৪ সালে আকবর আগ্রা দুর্গ বানাতে শুরু করেন, যেটি ছিল হুমায়ুনের সমাধিসৌধ বাদ দিলে ১৫৪৫ সালের পর প্রথম স্থাপত্যের নিদর্শন। একটা মসজিদ অবশ্য দিল্লিতে তৈরি হয়েছিল (*খইরুই মনজিল*) যেটি শুরদের ধাঁচে করা। আকবরের স্থাপত্যের সঙ্গে পূর্ববর্তী স্থাপত্যের যোগসূত্র বলে এটিকে ধরা যেতে পারে।

আকবরের সৌধগুলি প্রধানত লাল বালুপাথরে তৈরি যার মাঝে মধ্যে সাদা মার্বেল পাথর লাগান হয়েছিল। সাধারণত এগুলি তৈরি হয়েছিল *ট্রাবিয়াট* ধরনে, যদিও *টিউডর* খিলান লাগানো হচ্ছিল ভালো দেখানোর জন্য। লাহোর বা কাশ্মীরে যে ধরনের কাঠের কাজ হত, তার সঙ্গে এগুলির মিল ছিল। এই আদি মুঘল স্থাপত্য যুগে, গম্বুজ ছিল লোদী ধরনের। এর ভিতরটা ফাঁক থাকলেও, তখনো সঠিক গম্বুজ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেনি। দেওয়ালে ও ছাদের ভিতর দিকে রং করা হত ও ভাস্কর্য্য করার রীতি ছিল।

আগ্রা প্রাসাদ দুর্গ একটা অনিয়মিত অর্ধ বৃত্তাকার। এর মাঝের রাস্তা প্রায় ২৭০০ ফুট লম্বা যমুনার দক্ষিণপাড়ের সমান্তরাল হয়ে চলে গিয়েছে। চারপাশের দেয়ালটি লাল বালুপাথরের এবং সত্তর ফুট উঁচু। এর ব্যাসার্ধ ছিল দেড় মাইল। এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে পাথরগুলিকে সমান করে কেটে লোহার আংটা দিয়ে একে অপরের সঙ্গে লাগানো এমনভাবে যে উটের লেজও এর ভিতর দিয়ে গলতে পারে না। এর মধ্যে সামরিক যুদ্ধকৌশলের উপযোগী করে সাজানো হয়েছিল অত্যন্ত সুন্দরভাবে।

আগ্রার দুর্গের দুটি দরজা ছিল। দক্ষিণদিকের দরজাটি ছিল ব্যক্তিগত প্রবেশের জন্য। পশ্চিমদিকের দরজাকে বলা হত দিল্লি দরওয়াজা এবং ওটাই ছিল প্রধান প্রবেশপথ। দরজাটি তৈরি করা শেষ হয় ১৫৬৬ সালে। এর পরিকল্পনা ছিল খুব সহজ। দুটি চওড়া অষ্টকোণাকৃতি মীনার একটা খিলানযুক্ত তোরণের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। এর পিছনে ছিল

Scanned with CamScanner

খিলানযুক্ত চাতাল, যার চারপাশ ঘিরে রয়েছে মুকুটযুক্ত ছত্রী। ভিতরে রক্ষীদের থাকার জন্য কতকগুলি ঘর আছে। এর সমৃদ্ধশালী অলঙ্কার সাদা মার্বেল পাথরের মধ্যে নানান ধরনে করা। লাল পাথরের পটভূমিকায় একটা বিশেষ সৌন্দর্য দান করেছে। একটি পাখীর প্রতীককে বারবার ব্যবহার করা হয়েছে, যেটি অনুশাসনের বিরুদ্ধে। আকবরী সৌধগুলির মধ্যে এই ধরনের পশুপাখীর ব্যবহার দেখা যায়, যা তাঁর অন্যধর্মের প্রতি সহনশীলতার পরিচয় দেয়।

আবুল ফজল বলছেন যে এই ঘেরা দেওয়ালের মধ্যে পাঁচশোর বেশি বাড়ি করা হয়েছিল, যেগুলি লাল বালুপাথরে বাংলা ও গুজরাটি স্থাপত্যের অনুকরণে করা। দুর্ভাগ্যবশত শাহজাহানের সময়ে মার্বেল পাথর দিয়ে সৌধ করার জন্য এইসব বাড়ির অধিকাংশই ভেঙে ফেলা হয়। এগুলি আগে ছিল দুর্গের পশ্চিমদিকে, যেখান থেকে এগুলি ক্রমশ ছাদের কিনারা ধরে পূর্বদিকে সরে যেতে থাকে। এর ফলে এগুলি ছিল নদীর উপরে। এগুলির মধ্যে একটি এখনো রয়ে গিয়েছে, যাকে *জাহাঙ্গিরী মহল* বলে বলা হয়। সম্ভবত যুবরাজ সলীম এখানে থাকতেন। এই প্রাসাদটিই প্রথম এই ধরনের সৌধ। এর মধ্যেকার হল ও ঘরগুলি অনিয়মিত ভাবে তৈরি এবং কোন সমতা নেই। *জাহাঙ্গিরী মহল* মুঘল স্থাপত্যযুগের পরিবর্তনের একটি স্তর যার মধ্যে হিন্দু প্রভাব রয়ে গিয়েছে। পঞ্চদশ শতকের শেষে তৈরি গোয়ালিয়রের *মানমন্দিরের* সঙ্গে এর তুলনা করা যায়। এযুগের আকবরী স্থাপত্য তখনো দিশা খুঁজে বেড়াচ্ছে। সেটা বোঝা যায় এর বারান্দার স্তম্ভগুলি ও ছাদের বরগার ব্যবহার থেকে।

লাহোর ও এলাহাবাদেও আকবর এই ধরনের দুর্গ করেছিলেন। লাহোরের দুর্গপ্রাসাদ আগ্রার সময়েই করা হয়েছিল এবং পরিকল্পনাও ছিল একই ধরনের। কিন্তু লাহোর দুর্গ অনেক বেশি নিয়মিত। একটা উঁচু বুরুজ দেওয়া দেওয়ালের মধ্যে এটি ছিল লম্বায় ১২০০ ফুট ও চওড়ায় ১০৫০ ফুট। এর ফলে ভিতরের অংশগুলির মধ্যে অনেক বেশি প্রতিসাম্য রয়েছে। পুরো আয়তক্ষেত্রাকার জায়গাটি লম্বা করে সমানভাবে ভাগ করা হয়েছে। দক্ষিণ দিকটা রাখা হয়েছে দপ্তর ও কাজের বাড়ির জন্য এবং পিছনের অংশটি রাখা হয়েছে রাজপ্রাসাদের জন্য। এই দুই ধরনের বাড়ির মধ্যে কতকগুলি বাড়ি রয়েছে যা বেড়ার সৃষ্টি করেছে যাতে লোকেরা না যেতে পারে। আগ্রার মত করেই এর স্থাপত্য করা হয়েছিল। কিন্তু লাহোরে অলঙ্করণের মধ্যে কারিগরদের অনেক বেশি স্বাধীনতা দেখা যায় আগ্রার থেকে। উত্তরদিকের দেয়ালে যে ভাস্কর্য্য রয়েছে তাকে অসাধারণ বলা যায়। হাতিপোল থেকে জাহাঙ্গিরী মহলের দেয়ালে যে রঙীন উজ্জ্বল ভাস্কর্য্যের চিহ্ন রয়েছে তার থেকে দেখা যায় যে বিশেষ বিষয়গুলি এক জায়গায় গোষ্ঠীভুক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে আছে হাতির যুদ্ধ, পোলো খেলার দৃশ্য, শিকার কাহিনী ইত্যাদি। এই দেয়ালচিত্রগুলি ইঁটের উপর পরবর্তীকালে করা হয়েছে।

যমুনা ও গঙ্গার সঙ্গমস্থলে এলাহাবাদের দুর্গ শুরু হয়েছিল ১৫৮৩ সালে। বিশেষ কোণের জন্য এর চেহারা হয়ে যায় বৃত্তের অনিয়মিত অংশের মত। আকবরের তৈরি

Scanned with CamScanner

এটাই সব থেকে বড় দুর্গ—এর চওড়া তিনহাজার ফুটের বেশি। এর সৌধগুলির মধ্যে একটা রয়ে গিয়েছে যাকে *বরাদারী* বা *জেনানা মহল* বলে বলা হয়। দুর্গের মধ্যে রাজ-পরিবারের জন্য এই ধরনের আরো কতকগুলি সৌধ ছিল বলে মনে করা যায়। এর প্রধান সৌন্দর্য হচ্ছে যে মধ্যেকার হলঘরের চারপাশের সাজানো স্তম্ভগুলি। এই স্তম্ভগুলি জোড়ায় সাজানো—কেবল কোণগুলিতে চারটে করে স্তম্ভ রয়েছে। স্তম্ভগুলির উপরে চাতাল দেওয়া ছাদ আছে যার সঙ্গে রয়েছে জাফরীকাটা ছাদের কিনারা। এর সঙ্গে আছে ছত্রী যেগুলি জাফরীকাটা পাথরের পর্দা দিয়ে ঢাকা।

১৫৭০ সালে তৈরি আজমীরের দুর্গ এগুলির থেকে আলাদা এবং প্রধানত কাজের জন্যই করা হয়েছিল। ছোট হলেও এটি খুব শক্ত করে বানানো যার ফলে এটি ইউরোপের দুর্গের *ডনজন* (donjon)-এর কথা মনে করিয়ে দেয়। দুটি খুব চওড়া পাঁচিল দিয়ে এটি ঘেরা ছিল। এর মধ্যে ছিল একটা স্তম্ভযুক্ত হলঘর যেটি প্রাসাদের ধরনের। দোতলা এই বাড়িটিতে ছিল দুটি স্তম্ভের সারি। এর প্রতিটি কোণে ঘর আছে এবং মাঝখানে একটা বড় ঘর রয়েছে, যার থেকে মনে করা যায় যে সম্রাট বাইরে গেলে ওঁর থাকার জায়গা এটা ছিল। এই ছোট সুন্দর বাড়ি ও চারপাশের কঠিন দেয়াল একটা বিপরীত দৃশ্যের সৃষ্টি করে।

আকবরের সম্ভবত বিরাট কাজ ছিল ফতেপুরসিক্রী তৈরি করা। আগ্রার ছাব্বিশ মাইল পশ্চিমে একটা জায়গা পছন্দ করে এটি তৈরি করা হয়েছিল। চারপাশের জমি থেকে পাথরের টিলার উপরে খুব অল্পসময়ের মধ্যে এটি তৈরি করা হয়েছিল। এর মধ্যে ছিল থাকার বাড়ি, দপ্তর, ধর্মালোচনার জায়গা, পশুশালা ইত্যাদি যার সমন্বয় ভারতে বিরল।

আকবরের কোন পুত্রসন্তান না হওয়ায় উনি ১৫৬৮-৬৯ সালে সিক্রীতে শেখ সলীম চিস্তির খানকাতে আসেন। এর দক্ষিণ-পশ্চিমে একটা প্রাসাদ তৈরি করা হয় যাকে *রংমহল* বলা হত। এখানেই ১৫৬৯ সালে সলীমের জন্ম হয়। আকবর ওখানে একটি মসজিদ তৈরি করান। ১৫৭১ সালে আকবর আবার এলে একটা বিরাট প্রাসাদ বানানো হয় এবং অভিজাতরা তাদের বাড়ি তৈরি করতে থাকেন।

পূর্বদিকে যেখানে উঁচু জায়গা ঢালু হয়ে গিয়েছে ওখানে রাজপ্রাসাদ তৈরি করা হয়েছিল। সৌধের বিভিন্ন অংশ তৈরি করে জোড়া লাগানো হয়েছিল। বারো বছর ধরে আকবর এখানে থাকেন। ১৫৮৫ সালে আকবর লাহোরে চলে যান। ১৫৯১ সালে ফৈজী লক্ষ্য করেন যে বাড়িগুলি রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ভেঙে পড়ছে।

প্রায় দশ কিলোমিটার ব্যাসার্ধ নিয়ে ফতেপুরসিক্রী সাম্রাজ্যের কেন্দ্রবিন্দু হয়েছিল। এর উঁচু পাঁচিল প্রায় ছয় কিলোমিটার ধরে শহরকে উত্তর থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে ঘিরে রেখেছে। পশ্চিমদিকে একটা বড় হ্রদ কেটে ঐদিক থেকে শহরকে সুরক্ষিত করে রেখেছে। শহরের চারদিকেই দরজা ছিল। দরজাগুলি একই ধরনের—অর্ধচন্দ্রাকৃতি বুরুজ দিয়ে দুপাশে ঘেরা। এই চেহারার সঙ্গে শের শাহের পুরানো কেল্লার দরজার মিল পাওয়া যায়।

Scanned with CamScanner

আগ্রা থেকে আগ্রা দরজা দিয়ে ঢোকার পর দক্ষিণে পাঁচকোণা ঘর দেখা যায়, যেটি ছিল সরাইখানা। এটিকে ভুল করে কোতোয়ালী বলা হচ্ছে। এর দক্ষিণে ফতেপুরের টিলা যার উপর ছিল অভিজাতদের বাড়ি। দক্ষিণের পথটি মুঘল বাজারের ধ্বংসস্তূপের মধ্য দিয়ে চলে গিয়েছে প্রাসাদ চত্বরে। এর কাছে ছিল *চাহার সূক* যেখানে নহবত বাজানো হত। আকবর সাধারণত ফতেপুরে আসতেন হাতিপোলের সামনে দিয়ে। নহবতখানা তখন ওখানেই ছিল।

লালপাথরে তৈরি ফতেপুরসিক্রী প্রধানত উত্তর-পূর্বদিক থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে চলে গিয়েছে। এর বাড়িগুলি এমনভাবে কোণা করে বানানো যে উত্তর ও দক্ষিণদিকে মুখ করা—জামা মসজিদের সঙ্গে মিলিয়েই করা হয়েছিল খুব তাড়াতাড়ি। প্রাসাদ এলাকা তৈরি করার জন্য দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কারিগর আনা হয়, যার সাক্ষ্য বাড়িগুলির মধ্যে পাওয়া যায়। ওখানকার টিলার পাথর কেটেই শহর ও প্রাসাদ তৈরি করা হয়েছিল এবিষয়ে সন্দেহ নেই।

পাদ্রী মনসারেট দৌলতখানা, হারামসরা (মহিলাদের বাসস্থান) ও অন্যান্য সৌধের প্রশংসা করেছেন। এগুলি বর্তমানে আলাদা সৌধ হিসাবে দেখলেও আকবরের সময়ে সংলগ্ন ছিল। একটা পরিকল্পনার অংশ হিসেবে এগুলি ছিল তিনটি ভাগে বিভক্ত। সবটা মিলিয়ে একটা প্রাসাদ-দুর্গের চেহারা নিয়েছিল যার দরজা ছিল হাতিপোলে। হারামসরা একটা জাফরীকাটা ঢাকা বারান্দা দিয়ে দৌলতখানার সঙ্গে যুক্ত ছিল।

আগ্রা দরজা দিয়ে সোজা এগোলে পাওয়া যায় *দেওয়ান-ই আম*। এর থেকে আরো এগোলে জামা মসজিদ। *দিওয়ান-ই আম*-এর পশ্চিমে ছিল দৌলতখানা যাকে রাজপ্রাসাদ বলা হয়। এর বৈশিষ্ট্য ছিল এর ভারতীয় অলঙ্কার। দৌলতখানার মধ্যেই ছিল বড় ঘরের মত একটা দু'কামরার জায়গা। এটিই ছিল *দেওয়ান-ই খাস*। দোতলায় ছিল একটি সুন্দর ঘর। এর একতলার পূর্বদিকে একসময়ে চিত্রিত ছিল। এটিই সম্রাটের থাকার ঘর বলে মনে করা হয়। এর পূর্বদিকে একটা স্নানাগার (*হাম্মাম*) ছিল যেখানে মাটির নীচের পাইপের সাহায্যে জল আনা হত। পশ্চিমদিকের দরজা দিয়ে দপ্তরখানায় যাওয়া যেত। এটি অন্যান্য বাড়ির সঙ্গে ১৫৭৪-৭৫ সালে তৈরি হয়। এর উত্তরদিকে বারোটা স্তম্ভের সারি রয়েছে চৌকো পাথরের উপরে। এর মধ্যে একটা বড় ঘরে কেরানি ও হিসাবরক্ষকরা কাজ করতেন।

দৌলতখানার চারপাশ ধরে বহু বাড়ির ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। হয়ত এখানেই *ইবাদতখানা* ছিল। একটি বাড়িকে *ফর্দখানা* বলে ধরা হয়েছে যেখানে অভ্যাগতরা থাকতেন। এর কাছেই একটি *হাম্মাম* দেখা যায়। এটি ছিল দুভাগে বিভক্ত—একটি স্নানাগার ও অন্যটি জল গরম করার ঘর। এর জন্য পাত্র বসানোর জায়গাও ছিল। পাশের ঘরে একটা ছোট চৌবাচ্চা ছিল। মাটির নীচে জলের চৌবাচ্চা ও ময়লা নিষ্কাশনের নালী রয়েছে। লাখোরী ইঁট ও ছোটখাট পাথরের টুকরো দিয়ে বাড়িটি তৈরি হয়েছিল। জল গরম করার ঘরটির মেঝে লাল পাথর দিয়ে করা হলেও, শৌচাগারের মেঝে চুন-সুরকি দিয়ে করা। এছাড়াও অন্য জায়গায়, যেমন *হাউস-ই সিরিনের* উত্তর-পশ্চিমে শৌচাগার ও *হাম্মাম* দেখা যায়। এখানে

Scanned with CamScanner

হাম্মামে তিনটে ঘর ও একটি স্নানাগার রয়েছে যেটি অষ্টকোণ। *হাম্মামের* গম্বুজ দেওয়া ছাদ রয়েছে।

হারামসরার মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বাড়িকে বলা হয় যোধাবাঈ-এর প্রাসাদ। দক্ষিণ দিকে স্নানাগার ও শৌচাগার, উত্তরে ঝোলানো বারান্দা। বাঁদিকে ছিল পাথরের ঘর যেখানে রক্ষী রাজপুতরা থাকত। একটা নীচু পথ ছিল যেখান দিয়ে দৌলতখানায় যাতায়াত করা যেত। জাফরীকাটা দেয়াল দিয়ে ঢাকা এ পথ দিয়ে সম্রাট *খোয়াবগাহ* থেকে হারামসরার যে কোন জায়গায় যেতে পারতেন। এটি একটা বিরাট বড় বাড়ি। প্রধান ঢুকবার পথটি ছিল দোতলা যেখানে খোজারা পাহারা দিত। পথটি এঁকে বেঁকে অন্ধকার জায়গা দিয়ে গিয়েছে। মাঝখানে একটা চৌকো উঠান ও তার মাঝে ফোয়ারা। বাড়িটির জমি, স্তম্ভ ইত্যাদি গুর্জরাটি হিন্দু স্থাপত্যের আদলে গড়া যার মধ্যে ঘণ্টা-শিকল, পদ্ম ইত্যাদি অলঙ্কার রয়েছে। এর উত্তর ও দক্ষিণ দিকের ছাদে ঘন নীল রঙের উজ্জ্বল টালি।

এর সঙ্গে লাগোয়া উত্তর দিকে *হাওয়া মহল*। দোতলা বাড়ির দোতলা পাথরের জাফরী দিয়ে ঢাকা। এখানে সম্রাট এসে বিশ্রাম করতেন বলে প্রবাদ আছে। *হাওয়া মহল* পারস্য দেশের উঁচু মিনারের মতন যার সঙ্গে ইটালীর ঘণ্টা-মিনারের সাদৃশ্য আছে। এখান থেকে ঢাকা পথে মহিলাদের বাগানে ও হাতিপোলে যাবার ব্যবস্থা ছিল।

দিওয়ান-ই আম থেকে পাঁচ মহলে আসা যায়। স্তম্ভের উপর ভিত্তি করে চারতলা উঁচু সৌধটি দাঁড়িয়ে আছে। জমিতে চুরাশিটি স্তম্ভ রয়েছে এবং যত উপরে যাচ্ছে ততই স্তম্ভের সংখ্যা কমে সরু হয়ে আসছে। সব মিলিয়ে রয়েছে ১৭৬টি স্তম্ভ। পারসীকরা উঁচু বাড়ি তৈরি করেছিল গরমের হাত থেকে বাঁচার জন্য, যাকে বলা হত *বাদগীর*। *হাওয়া মহল* ঐ ধরনের। যোধাবাঈ-এর প্রাসাদেও ঐ ধরনের যদিও বেশ কিছু অমিল রয়েছে। *হাওয়া মহলের* প্রথম তলার স্তম্ভগুলির মধ্যে কোন মিল নেই এবং অলঙ্কারের মধ্যে যথেষ্ট তারতম্য রয়েছে। এখানেও হিন্দু ঘণ্টা-শিকল দেখা যায়।

হারামসরার চত্বরের উত্তর-পশ্চিম দিকে যে বাড়িটা আছে তাকে *সুনহারা মকান* বা *মরিয়াম কা কোঠি* বলা হয়। ভিতরের দেয়ালে বর্ণাঢ্য চিত্রসম্ভার রয়েছে। উত্তর দিকের দেয়ালে রাম ও হনুমানের চেহারা দেখা যায়—পরিষ্কার হিন্দু ছাপ এটির বৈশিষ্ট্য। সোনার জলে সারা বাড়ি চিত্রিত করা হয়েছিল। এর মধ্যে কবি ফৈজীর কবিতার অংশবিশেষও রয়েছে।

সাধারণত এ বাড়িটিকে আকবরের পর্তুগিজ স্ত্রী মরিয়ামের বাড়ি বলে ধরা হয়। ইতিহাসে ঐ পর্তুগিজ স্ত্রীর কোন উল্লেখ নেই। হিন্দু ভাস্কর্য্যের ছাপ থাকায় মনে করা যেতে পারে যে এটি ছিল আকবরের প্রথম রাজপুত স্ত্রী মরিয়াম জামানীর (বিবাহ ১৫৬২) বাড়ি। কিন্তু মরিয়াম এখানে থাকেন নি। উনি হারামসরার মধ্যে অন্যান্য রাজপুত মহিলাদের সঙ্গে থাকতেন। এ বাড়ির উত্তর-পশ্চিম কোণে ছিল পাঁচিলঘেরা বাগান। অন্যান্য মুঘল বাগানের মতই এটি ছিল *চাহারবাগের* ধাঁচে গড়া। পথগুলির মাঝখানে ছিল নালা যেখানে জল

Scanned with CamScanner

আসত উত্তর দিকের জলের জায়গা থেকে। বাগানের মাঝখানে ছিল মাছের পুকুর যার জল আসত মধ্যবর্তী নালী থেকে। বাগানের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ছিল স্নানাগার। উত্তর দিকের দেয়ালে ছোট ছোট চোদ্দটি খাপ ছিল যার উপর দিয়ে জল আসত। ঐ খাপগুলিতে প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখলে জল রঙীন হয়ে যেত। বাগানের মধ্য দিয়ে মহিলাদের নাগিনা মসজিদে যাবার পথ ছিল।

হাতিপোল দরজার সরাইখানার পিছনে একটা বিরাট প্রাসাদ চত্বর সম্প্রতি বের করা হয়েছে। এর মধ্যে আছে আঠাশটি ঘর, একটি *হাম্মাম*, গোসলখানা, শৌচাগার ইত্যাদি। এছাড়া রয়েছে হ্রদের উপর তিন কামরা বিশিষ্ট ছত্রী, জল রাখার বিশাল চৌবাচ্চা, সুন্দর জলের নালী, ফোয়ারা, বিশাল দরজা ও মাটির নীচের ঘর। পুরো প্রাসাদটি তিনভাগে বিভক্ত। সব থেকে বড় অংশ উত্তর-পশ্চিম দিকে। একটা পাঁচিল দিয়ে আর দুটো অংশ থেকে এটি আলাদা করা হয়েছে। দেয়ালটি বাগানের মধ্য দিয়ে ঘুরে ফিরে গিয়েছে। বাগানটি চাহারবাগ ধাঁচের। এর মধ্যে নালী দিয়ে জল আনা হত। মাঝখানে একটা ফোয়ারা ছিল। অন্যদিক থেকে এখানে আসার জন্য দেয়ালের গায়ে একটা বিশাল দরজা ছিল। পশ্চিমদিকের দেয়ালে অসংলগ্ন ছটা ঘর আছে যার মধ্যে তাক রয়েছে।

চাহারবাগ ছাড়িয়ে উত্তরের দিকে সামোশা মহলের কাছে গম্বুজ দেওয়া বড় একটা *হাম্মাম* রয়েছে। স্নানের তিনটি ঘর ছাড়া, হাম্মামের তিনটি ঘর আছে। পোড়ামাটির নালী ও বাঁধানো চৌবাচ্চাও আছে। খুব সুন্দর এই সৌধটির দেয়ালে নানারকম ফলফুল খোদাই করা আছে। আরো পশ্চিমে জলাধার যার সঙ্গে এই চত্বরের নালীর যোগ আছে। এই জলাধারের তলায় মাটির নীচে কতকগুলি ঘর আছে। অন্য দুটি অংশে আরো ঘর দেখতে পাওয়া যায় যার কোন কোনটা চতুষ্কোণ ঘর।

প্রাসাদ চত্বরটি কার ছিল এ নিয়ে বিতর্ক আছে। প্রাক্তন প্রত্নতত্ত্ববিদ এটিকে আকবরের হারেমের অংশ বলে মনে করেছেন। কিন্তু এই মত মানা শক্ত। এর চারপাশে রয়েছে *সামোশা মহল*, জামা মসজিদ, সরাইর দারোগার বাড়ি এবং চিস্তিদের থাকার জায়গা। আমলাদের বাড়ি ও অন্যান্য দপ্তরগুলিও কাছে।

চত্বরে পরিষ্কারভাবে কাটা পাথর লাগানো হয়েছে। এছাড়াও দেয়ালচিত্র, ভিতরের ভাস্কর্য্য ও দেয়ালের কাজ খুবই সুন্দর। ভিতরের দেয়ালগুলি তাজমহলের কাজের সঙ্গে তুলনীয়। এমনকি মাটির নীচের ঘরগুলিও সাদা জমির উপর লাল রং করা। এ ধরনের কাজ শাহজাহানের সময় করা হত। ১৬৫২ সালের আগে এটি তৈরি করা হয়েছিল এবং শাহজাহান এখানে বাস করেছিলেন।

টিলার সব থেকে উঁচু জায়গায় তৈরি করা হয়েছিল জামা মসজিদ। এটি তৈরি করতে সময় লেগেছে পাঁচ বছর এবং এটি শেষ হয় ১৫৭১-৭২ সালে। মসজিদে ঢোকার আগে পড়ে *বাদশাহী দরওয়াজা*। আকবর এর মধ্য দিয়েই প্রার্থনা করতে আসতেন। এর পরে উঠান ও সলীম চিস্তির মার্বেল পাথরের সমাধি। এই উঠান থেকে *বুলন্দ দরওয়াজায়* আসা

Scanned with CamScanner

যায়। গুজরাট বিজয়ের পর আকবর এই দরজাটি তৈরি করেন ১৫৭৫-৭৬ সালে। এর সামনে একটা বিরাট জলাধার ও *হাম্মাম* আছে, যেটি সম্ভবত ইসলাম খান সর্বসাধারণের জন্য তৈরি করেছিলেন।

দেশের বড় মসজিদগুলির অন্যতম, জামা মসজিদে তিন দিক দিয়ে ঢোকা যেত। এখন শুধু পূর্ব দিকের ঢোকার ব্যবস্থাই অবিকৃত আছে। এদিক দিয়েই রাজা আসতেন। এই মসজিদের ভিতরের অংশটিই একে বিশেষ বৈশিষ্ট্যদান করেছে। অন্যান্য মসজিদের মতই এর চতুষ্কোণ থেকে ভিতরে যাওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। সামনে বিশাল অষ্টকোণ চেহারার মধ্যে মাঝখানের বড় কুঠুরি রয়েছে যেটা ক্রমে দুপাশে চলে গিয়েছে। এর পিছনে বড় একটা গম্বুজ উঠে গিয়েছে এবং পাশে ছোট ছোট গম্বুজ রয়েছে। এই দুই পাশে স্তম্ভ দেওয়া ছত্রী রয়েছে যেগুলির ধার মাঝেমাঝে কানাৎ দিয়ে ভাঙা হয়েছে। এগুলির সঙ্গে ভিতরের ব্যবস্থার যোগ রয়েছে। ভিতরটা বারান্দা বাদে মসজিদের মূল অংশ হয়ে গিয়েছে, যার সঙ্গে তিনটি দরজা বড় কুঠুরির দুপাশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেছে। খিলানযুক্ত দরজার মধ্য দিয়ে ঢুকলে বড় হলঘর যার পশ্চিমদিকে প্রধান *মিহরাব*। প্রধান গম্বুজটি একে ঢেকে রেখেছে উপর থেকে। পাশের সারিগুলিতে ছোট গীর্জার মত করা মাঝামাঝি, যার উপর ছাদ হিসাবে রয়েছে ছোট গম্বুজগুলি। দু'পাশের স্তম্ভযুক্ত সারি ফাঁকা হলঘরের মধ্যে বৈচিত্র্য নিয়ে আসে। স্তম্ভগুলি সুন্দরভাবে গোষ্ঠীযুক্ত করা। এর সঙ্গে রয়েছে চমৎকারভাবে সাজানো বরগা ও ঢাকা ছত্রী যেগুলি ভিতর ও বাইরেকে যুক্ত করে রেখেছে। ভিতরের দেয়ালের প্রায় সবটাই নানা ধরনের অলঙ্কার করা, যার মধ্যে রয়েছে বাঁকানো ধাঁচ, রঙীন ও পাথর বসানো অলঙ্কার। আকবরের অন্য কোন সৌধতে এই দৃশ্য দেখা যায় না।

বুলন্দ দরওয়াজা উচ্চতায় ১৩৪ ফুট যেখানে যেতে হত ৪২ ফুট উঁচু সিঁড়ি বেয়ে। এর ফলে রাস্তা থেকে এর উচ্চতা প্রায় ১৭৬ ফুট হয়েছে। শহরের অন্য সব বাড়ি এর তুলনায় কম উঁচু। একমাত্র আগ্রার দুর্গের দিল্লি দরজা এর সঙ্গে তুলনীয়, যদিও বুলন্দে জায়গা অনেক বেশি। বুলন্দের অবস্থানটি অবশ্য খুব সুখকর নয়—এটি যেতে হয় কাজের লোকেদের জায়গা ও *হাম্মামের* পাশ দিয়ে। এর উচ্চতার ফলে মসজিদ তার প্রাধান্য হারিয়েছিল।

বুলন্দ দরওয়াজার সামনের অংশ ও পিছনের অংশ আলাদাভাবে তৈরি। সামনের মাঝখানের জায়গাটা ৮৬ ফুট আড়াআড়িভাবে করা। এর চেহারা সমকোণী চতুর্ভুজের মত। পিছনের অংশটি সাদাসিদে এবং মসজিদের চত্বরে গিয়ে পড়েছে। সামনের মাঝাখানের প্রধান জায়গা নিয়েছে খিলানযুক্ত গম্বুজওয়ালা কুঠুরির মত। পাশের সরু জায়গা তিনতলা। প্রতিটি তলার ফাঁক আলাদা। এ দরজার সব থেকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অংশ হল এর সামনের মাঝখানের খিলানযুক্ত আধা-গম্বুজ কুঠুরি যেটি মাটি অবধি নেমে গিয়েছে। এই সামনের অংশে জাফরীকাটা কার্ণিশ রয়েছে যার পিছনে ছত্রীর সারি। এদের ছত্রীর উপরের অংশগুলি সমান্তরাল রেখায় থাকার ফলে একটা বিভাজান নিয়ে আসে। সামনের অংশে পাশের জায়গাতে লেখনী অলঙ্কৃত করেছে, যার মধ্যে রয়েছে যীশু খ্রিস্টের একটি বাণী 'পৃথিবীটা একটা সাঁকো, এর উপর দিয়ে চলে যাও, কিন্তু কোন বাড়ি কোর না'।

Scanned with CamScanner

পাথর থেকে মার্বেল ঃ জাহাঙ্গীর

জাহাঙ্গীর স্থাপত্যের থেকে অণুচিত্রের প্রতি বেশি অনুরাগী ছিলেন, যদিও তাঁর সময়ে (১৬১৩ সালে) আগ্রার কাছে সিকান্দ্রাতে আকবরের সমাধিসৌধ তৈরি হয়। সম্ভবত স্থান নির্বাচন ও পরিকল্পনা আকবর বেঁচে থাকতেই হয়েছিল। কিন্তু তৈরি করেন জাহাঙ্গীর। একদিক থেকে এটি ছিল গম্বুজওয়ালা মুঘল স্থাপত্যের ব্যতিক্রম। কিন্তু এটিকে সৌন্দর্য দান করার জন্য যে প্রতিসাম্যের প্রয়োজন ছিল, তার অভাব দেখা যায়।

একটা বিশাল বাগানের চারপাশে দেয়াল দিয়ে ঘিরে মাঝখানে ৩২০ ফুট চতুষ্কোণের উপর ১০০ ফুট উচ্চতা নিয়ে সমাধিসৌধ অবস্থিত। বাইরের চারদিকে দেয়ালে চারটি বড় দরজা আছে, যার মধ্যে তিনটি দরজার মত করে করা প্রতিসাম্য আনার জন্য। দক্ষিণ দিকে ছিল ঢোকার প্রধান দরজা। এই দরজাটি অতীব সুন্দর। এর মধ্যে পাথর বসিয়ে অলঙ্কার করা হয়েছিল এবং এর সঙ্গে রয়েছে চারটি সাদা মার্বেল পাথরের মিনার, প্রত্যেকটিই এক একটা কোণায়। এই ধরনের মিনার ভারতীয় স্থাপত্য শিল্পে এই প্রথম এল। এর ভিতর দিয়ে ঢুকলে যে বাগান দেখা যায় সেটি এমনভাবে সাজানো যে সমাধিসৌধের সঙ্গে মিলেমিশে রয়েছে। বাগানের পথগুলি কিছুদূরে দূরে একটা চতুষ্কোণ চাতালে পড়েছে যার মধ্যে একটি ফোয়ারা রয়েছে নীচু হয়ে যাওয়া জলের পাত্র সমেত।

সাধারণভাবে সমাধিসৌধটি একটা নীচু খণ্ডিত পিরামিডের মত যেটি তিনটে তলার উপরে উঠে গিয়েছে। জমিতে একটা বিশাল চাতাল রয়েছে যার উপরে রয়েছে তিনটি স্তরে বিভক্ত লাল পাথরের ছত্রী। এগুলি একটা খোলা চাতালে পড়েছে। উপরের তলায় একটা জাফরীকাটা মার্বেল পর্দা রয়েছে। একতলাটি ৩০ ফুট উঁচু ও পাশে ৩০০ ফুট এবং এর চারদিকে খিলানযুক্ত কুঠুরি রয়েছে। প্রত্যেকটির পাশ থেকে মাঝখান দিয়ে উঠে গিয়েছে সমকোণী চতুর্ভুজ খিলানযুক্ত কুঠুরি এবং এদের উপরের কার্ণিশে রয়েছে মার্বল পাথরের ছত্রী যেগুলি বৈচিত্র্য এনে দিয়েছে। দক্ষিণ দিকের কুঠুরির একটা দরজা দিয়ে লম্বা বারান্দাতে যাওয়া যায় যেটি সমাধির ঘরে গিয়েছে। এটি একটা ছোট ঘর, অনেকটা ঈজিপ্টের পিরামিডের মতন গর্ভগৃহ। সম্ভবত এর জমির উপরের পাথরগুলি আকবরের জীবদ্দশাতে বসানো হয়েছিল। এর দৃঢ়তার সঙ্গে উপরের হাল্কা তলার মিল খুব কম। এর ফলে উপরের ওজন অনেক কম বিশেষত মাঝারী অংশটিতে এর বিপরীতধর্মী আলো-ছায়া একটা অস্থিরতার সৃষ্টি করে। এগুলি তৈরি হবার মধ্যেই জাহাঙ্গীর এতে হস্তক্ষেপ করেন ও তৈরি করা অংশগুলি ভেঙে ১৫ লক্ষ টাকা খরচ করে নূতন করে বানান। ভাঙা কিছু অংশ অদলবদল করে আবার ব্যবহার করা হয়েছিল তার নিদর্শন রয়েছে। বাবা ও ছেলের মানসিকতার দ্বন্দ্ব এর মধ্যে দেখা যায়। কিন্তু এর পর থেকেই মুঘল স্থাপত্য দৃঢ়তার থেকে সুদৃশ্য করার দিকে মন দেয়।

এই সমাধিসৌধের সব থেকে উপরের তলাটি অন্য অংশের থেকে আলাদা। এটি সম্পূর্ণ সাদা মার্বেল পাথরে তৈরি। সাদা মার্বেল পাথরের জাফরী একে একটা হাল্কা আমেজ

Scanned with CamScanner

দিয়েছে এবং প্রতি কোণাতেই সুদৃশ্য ছত্রী একে একটা সৌন্দর্য দান করেছে। এই তলার ভিতরে একটা বড় চাতাল আছে যার চারপাশে খিলানযুক্ত কুঠুরি রয়েছে। এদের মাঝখানে অপূর্ব অলঙ্কারে ভরা একটা সমাধির ঢাকনা রয়েছে। ফারগুসনের মতে এই অংশটি অসমাপ্ত কারণ এর উপরে গম্বুজ বসানোর কথা, যেটি পিরামিড ধরনের বাড়ির উঁচু শিখর।

জাহাঙ্গীরের সময়ে আরো কয়েকটা ছোটখাট স্থাপত্যের নিদর্শন চোখে পড়ে। এর মধ্যে ধরা যায় জলন্ধরের সরাই-এর একটা দরজা। শেষজীবনে জাহাঙ্গীর লাহোরের কাছে শহদরায় নিজের সমাধিসৌধ শুরু করেছিলেন। ওঁর মৃত্যুর পর ওঁর স্ত্রী নূরমহল বেগম এর অধিকাংশ অংশই তৈরি করে দেন। রবি নদীর পাড়ে একটা বিশাল চতুষ্কোণ বাগানের মাঝখানে এই সমাধি সৌধটি অবস্থিত। চারপাশে দেয়াল দিয়ে ঘেরা এর চারটি দরজা আছে। বাগানটি ষোলোটা সমান চতুষ্কোণে ভাগ করা। এর প্রতিটি মোড়ে একটা করে ফোয়ারা ও ছোট জলাধার রয়েছে। প্রতিটি চতুষ্কোণে ভিন্ন রঙের ফুল লাগানোর ফলে নানা রঙের সমাবেশ দেখা যায়। এসবের মাঝখানে সমাধিসৌধ বসানো। একতলা এই সৌধটির প্রতিটি পাশই ৩২৫ ফুট। অষ্টকোণ মিনার প্রতিটি কোণ থেকে ১০০ ফুট অবধি উঠে গিয়েছে। ছাদের মাঝখানে একটা সাদা মার্বেল পাথরের ছত্রী ছিল, যেটি এখন আর নেই। ভিতরে একদিক থেকে অন্যদিক পর্যন্ত ঘরের সারির মধ্য দিয়ে লম্বা বারান্দা চলে গিয়েছে। এর থেকে সমাধির ঘরে যাওয়া যায়। মধ্যে রয়েছে সাদা মার্বেল পাথরের ঢাকনা কবরের উপরে এবং ছাদের মধ্যের একটা ছোট ফাঁক দিয়ে আলো আসার ব্যবস্থা রয়েছে। সারা দেওয়াল রং করা, যার মধ্যে ব্যবহার করা হয়েছে ফ্রেসকো চিত্র, পাথর বসানো ও মোজেক টালীর, যা বাগানের পথেও পাওয়া যায়। সমাধির ঢাকনার উপর সাদা মার্বেল পাথরের অলংকার যার মধ্যে বসানো রয়েছে মূল্যবান রত্ন।

আকবরী যুগের সঙ্গে শাহজাহানী যুগের সংযোগ পাওয়া যায় ইতিমদউদৌলার সমাধিসৌধের মধ্যে। জাহাঙ্গীরের স্ত্রী নূরমহল এটি সমাপ্ত করেন ১৬২৬ সালে ওঁর বাবার সমাধি হিসাবে। বিশাল আয়তনের সুদৃঢ় সমাধিসৌধের বদলে এটাতে ছিল প্রতিসাম্য ও অপূর্ব অলঙ্কারের কাজ, যেটি একটা ছোট মুক্তার মত বসানো হয়েছিল। বাগানের চারপাশে দেয়ালে ঘেরা, যার পাশগুলি ছিল ৫৪০ ফুট। এই ছোট সমাধিসৌধটি সবুজ সাইপ্রাস গাছ ও লাল পাথরের দরজার মধ্যে বসানো। বাগানের বিভিন্ন অংশে জলাধার, পথ ও ফোয়ারা ছিল। ইমারতটি সম্পূর্ণ সাদা মার্বেল পাথরে করা একটা চতুষ্কোণ যার ব্যাসার্ধ ছিল ৭০ ফুট। মাঝখানের অংশের প্রতিটি কোণায় একটা করে অষ্টকোণাকৃতি মিনার উঠে গিয়েছে। এদের উপরে একটা ছত্রী ছাদ পেরিয়ে উঁচুতে চলে গিয়েছে। প্রত্যেক পাশেই খিলানযুক্ত খোলা দরজার মত আছে যেগুলি সৌধটিকে গভীরতা দান করেছে। ভিতরে উঁচুতে সরলরেখাগুলি একটা শান্তভাব নিয়ে আসে।

ভিতরে মাঝখানে সমাধির ঢাকনার চারপাশে ঘর ও বারান্দা রয়েছে। দেয়ালে সাদা মার্বেল অলঙ্কারে আবৃত এবং মসৃণ মেঝেতে দুটি হলুদ রঙের সমাধির ঢাকনা। মাঝখানের

Scanned with CamScanner

অংশটি সম্পূর্ণ সাদা মার্বেল পাথরে করা যার মধ্যে অসাধারণ ধরনের অলঙ্কার রয়েছে। এর দেয়ালগুলিতে বৈচিত্র্য আনার জন্য নানা রঙের পাথর বসানো। এর ফলে সাদা মার্বেল পাথরের ঔজ্জ্বল্য অনেক কমে যায়। এই পাথর বসানোর অলঙ্কার আগেকার কলাকৌশলের থেকে অন্যভাবে করা। এই দিক থেকে জাহাঙ্গীরের আমলের শেষদিকের স্থাপত্য পুরানো ঘরানার থেকে আলাদা। এর আগে এই ধরনের রং করা পাথর বসানোকে বলা হত *ওপাস সেকটাইল*, যার মধ্যে বিভিন্ন রং-এর মার্বেল পাথর বসিয়ে করা হত। কিন্তু এখন যেটা এল সেটাকে বলা হত *পিয়েট্রা ডুরা*, যার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের পাথর যেমন ল্যাপিস লাজুলী, কর্নেলিয়ান, জ্যাসপার, টোপাজ ইত্যাদি মার্বেল পাথরের মধ্যে বসানো হত। পরবর্তীকালে মার্বেল পাথরের উপর সোনা ও মণিমুক্তো বসানো অলঙ্কার দেখা যায়, ইতিমদউদৌলার সমাধি তার প্রথম পদক্ষেপ।

মার্বেলের যুগ ঃ শাহজাহান

১৬২৭ সালে সিংহাসনে আরোহণ করার পর থেকেই শাহজাহান লাল বালুপাথরের জায়গায় সাদা মার্বেল পাথর ব্যবহার করতে থাকেন। এর ফলে আকবরী স্থাপত্যের চেহারা বদলে যায়। যোধপুরের মাকরাণা থেকে উৎকৃষ্ট ও নরম মার্বেল পাথর এনে এগুলি বসানো হতে থাকে। এর সঙ্গে মধ্যে মধ্যে বসানো হতে থাকে নানা রঙের পাথর যেগুলি সাদার মধ্যে বৈচিত্র্য নিয়ে আসে।

সিংহাসনে বসার পরই শাহজাহান আগ্রা ও লাহোর দুর্গপ্রাসাদে মার্বেল বসাতে শুরু করেন। এ কাজ বহুদিন ধরে মাঝে মাঝে হয়েছিল। প্রথমে আগ্রা দুর্গের *দেওয়ান-ই আম*-এর সংস্কার করেন। এর দশ বছর পরে *দেওয়ান-ই খাস*-এর পরিবর্তন করেন, যেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল মার্বেল পাথরের জোড়া স্তম্ভ লাগানো। ১৬৫৪ সালে তৈরি করেন মোতি মসজিদ। এর মধ্যে মাঝে মাঝে মার্বেল হল ও ছত্রী লাগানো হয়েছে অন্যান্য সৌধেও যেমন শীশ মহল, নাগিনা মসজিদ ও মুসাম্মান বুরুজ। শেষেরটির সঙ্গে ছিল লাগোয়া বারান্দা ও নীচু করে বসানো ফোয়ারা।

এই সব মার্বেলের কাজের মধ্যে ছিল মোতি মসজিদ যেটি অনন্য বলে ধরা যায়। এর বৈশিষ্ট্য ছিল সামনের দিকে অসাধারণ প্রতিসাম্য ও বিভিন্ন অংশের সুষমতা ঢাকা তোরণ-শ্রেণীর মধ্যে, ছত্রীগুলির নমনীয় চেহারা, প্রায় অদৃশ্যভাবে কেন্দ্রীয় গম্বুজের উঠে যাওয়া এবং নিখুঁত পাথরের অবস্থান। এর ফলে এটি বিরল সৌন্দর্যের অধিকারী।

আগ্রার দুর্গের মত লাহোর দুর্গ প্রাসাদের মধ্যেও একই ধরনের কাজ হয়েছিল। এই দুর্গের উত্তরদিকে *দেওয়ান-ই আম*, *খোয়াবগাহ*, *শীশ মহল*, *মুসাম্মান বুরুজ* এবং *নওলাখা* একইভাবে মার্বেলে রূপান্তরিত হয়। পরবর্তীকালে এগুলির কিছু কিছু পরিবর্তন করা হয়েছিল।

১৬৩৯ সালে শাহজাহান দিল্লিতে বিশাল মাপের দুর্গ-প্রাসাদ তৈরি করে আগ্রা থেকে রাজধানী সরিয়ে নিয়ে যাওয়া মনস্থ করেন। আগ্রাতে যমুনা নদী ক্রমাগত পাড় ভেঙে

Scanned with CamScanner

কেল্লার গভীর খাদের সৃষ্টি হয়েছিল। দুর্গের প্রধান দরজা ছোট হয়ে যাওয়ায় লোকে ভীড়ে মারা যাচ্ছিল। যমুনার দক্ষিণ পাড়ে কাজ শুরু হয় ১৬৩৯ সালের মে মাসে এবং ১৯শে এপ্রিল ১৬৪৯ সালে শাহজাহান দেওয়ানখানা-ই খাসে প্রবেশ করেন।

১৬৫০ সালে মাটির পাঁচিল দিয়ে শহরকে ঘেরা হয়। বৃষ্টিতে এটি ভেঙে গেলে ১৬৫১ সাল থেকে ১৬৫৮ সাল পর্যন্ত কাজ করে ২০ ফুট উঁচু, ১২ ফুট চওড়া এবং ৩৮ মাইল লম্বা পাথরের পাঁচিল দেওয়া হয়। এই পাঁচিলের মধ্যে ছিল সাতশটি বুরুজ ও ছোট বড় বহু দরজা। এর মধ্যে সাতটি বড় দরজা নিয়মিত ব্যবহার করা হত।

শাহজাহানাবাদের পরিকল্পনার মধ্যে ইসলামীয় ও হিন্দু প্রভাব পড়েছিল। পুরানো হিন্দু শিল্প শাস্ত্র ব্যবহার করে রাজধানীর পরিকল্পনা করা হয়েছিল। একটি বাস্তুশাস্ত্র মানসারা (সম্ভবত আঃ ৪০০-৬০০ খ্রিস্টাব্দ) নদীর ধারে শহর যে ধনুকের মত হয়ে বসেছে, সেটি শাহজাহানের বাস্তুকারদের প্রভাবিত করেছিল বলে মনে হয়। ইসলামীয় প্রভাব এসেছিল প্রধানত ইরান থেকে। এই ধারণায় মানুষের শরীরকে শহরের সঙ্গে তুলনা করেছে।

ফতেপুরসিক্রীর লাল পাথর দিয়ে যমুনার দক্ষিণ পাড়ে উঁচু জায়গার উপর দুর্গ-প্রাসাদ করা হয়েছিল। এটির ভিতরের জায়গা আগ্রার দুর্গ-প্রাসাদের থেকে বড়। এটি ছিল অষ্টকোণাকৃতি এবং পাঁচিলটি ১২৫ একর জমি নিয়েছিল (৩১০০ ফুট × ১৬৫০ ফুট)। নদীর দিকে পাঁচিলের উচ্চতা ছিল ৬০ ফুট কিন্তু শহরের দিকে উচ্চতা ছিল ৭৫ ফুট। প্রাসাদ দুর্গে ছিল চারটি বড় দরজা, দুটো ছোট দরজা এবং একুশটি বুরুজ। স্থলের দিকে একটা বড় পরিখা দুর্গটিকে ঘিরে রেখেছিল।

দুর্গটি উত্তর থেকে দক্ষিণে চলে গিয়েছে যার কারণ সম্ভবত নদীজলের দিকের সঙ্গে প্রতিসাম্য রাখতে এটা করা হয়েছিল। এ ধরনের চিত্র ফতেপুরসিক্রীতেও দেখা যায়। এর প্রধান দুটি দরজার মধ্যে পশ্চিম দিকের মাঝামাঝি দেয়ালটির মধ্যে দরজাটিই ছিল প্রধান ঢোকার পথ (লাহোরী দরওয়াজা) এবং দক্ষিণ দিকের দরজাটি ব্যক্তিগত কাজের জন্য ব্যবহৃত হত। এই দুটি পথ একে অন্যকে সমকোণে ভেদ করে চলে গিয়েছে। লাহোরী দরজাটির পথটি ছিল অনেকখানিই ঢাকা যার ছাদটা ছিল ধনুকের মত। এই দুটি পথই সমকোণী আয়তক্ষেত্রের মধ্যে পড়ে ঘেরা জায়গার মধ্যে আর একটা ঘেরা জায়গা করেছে। এটির এলাকা ছিল ১৬০০ ফুট ও ১১৫০ ফুট এবং নদীর পাড়ে পূর্বদিকের দেয়ালে শেষ হয়েছে। এর বাইরে ছিল কাজের লোকেদের জায়গা, সৈন্যদের বাসস্থান ও বিভিন্ন কাজের জন্য সৌধ। আগের অংশটিতেই ছিল রাজপ্রাসাদ।

প্রাসাদ এলাকাটি চারভাগে বিভক্ত। প্রথমটি, একটা বড় চতুষ্কোণ অংশ যার মধ্যে ছিল দেওয়ান-ই আম, দ্বিতীয়টি ও তৃতীয়টি এর দুপাশে ছিল দুটো চৌকো বাগান ও চতুর্থটি এক সারি মার্বেলের প্রাসাদ যার একদিক থেকে বাগান ও অন্যদিক থেকে নদী দেখা যায়। এর প্রতিটি অংশই চৌকো ও আনুষ্ঠানিক এবং নদীর পাড় ধরেই এই প্রাসাদগুলি তৈরি হয়েছে। দেয়ালের উপরে এরকম ছটা মার্বেল প্রাসাদ দেখা যায় অনিয়মিত দূরত্বে রয়েছে।

Scanned with CamScanner

বাইরে থেকে এগুলির ভিতরে জাফরীর জানালা থাকায় কিছু দেখা যায় না। প্রাসাদ ছাড়াও এর মধ্যে রয়েছে *দেওয়ান-ই খাস* ও বিলাসবহুল *হাম্মাম*। এছাড়া রয়েছে নানারকম-ভাবে অলঙ্কৃত করা *রংমহল*। প্রতিটি সৌধই একতলা খোলা ঘরের মত, যার সামনে খিলান ঢাকা আছে *চামুজ* (চওড়া গুহার মত) দিয়ে। প্রতিটি কোণাতে সুন্দর ছত্রী রয়েছে। কোন স্তম্ভ নেই কিন্তু তার জায়গায় রয়েছে বিশাল চৌকো দেয়ালের গাঁথনী। ভিতরেও অলঙ্কার যুক্ত খিলান সমস্ত জায়গাটিকে সমকোণী চতুর্ভুজ করে রেখেছে। ছাদের ভিতর সুন্দরভাবে অলঙ্কৃত করা। ঘরগুলির ভিতরের সবজায়গায়ই নানা রঙের সোনার জল ও গিল্টি করা এবং ভিতরে রঙীন পাথর বসানো। এর মধ্যে দেয়ালে, গাঁথনীর মধ্যে ও খিলানে নানান ফুলের অলঙ্কার করা আছে।

রংমহল, যাকে শাহজাহানের রত্ন বলা হত, লম্বায় ১৩৫ ফুট ও চওড়ায় ৬৯ ফুট। এর মধ্যে রয়েছে বড় একটা হলঘর যার শেষে ছোট ঘর রয়েছে। প্রধান হলঘরটি পনেরোটা ভাগে বিভক্ত। প্রথমে এর বাইরের খিলানে জাফরীকাটা ছিল মার্বেল পাথরের মধ্যে। প্রত্যেকটি পাশের মাঝখানে তিনটি খিলান যুক্ত করে রাখা হয়েছিল।

দেওয়ান-ই খাস এ রয়েছে একটা প্রধান হলঘর যেটি লম্বায় ৯০ ফুট এবং চওড়ায় ৬৭ ফুট। এটি আরো খোলামেলা এবং এর সামনের দিকটায় পাঁচটি খিলান দিয়ে তোরণ করা হয়েছিল। পূর্বদিকে নদীর পাড়ে খিলান দেওয়া খোলা জানালা রয়েছে। খিলান দিয়ে ভিতরের হলঘরটি পনেরোটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। ভিতরের দেওয়ালে রঙীন পাথর দিয়ে করা ফুল ও লতাপাতা হলঘরটিতে একটা মৃদু আমেজ নিয়ে আসে। একদিক থেকে এটি *রংমহলের* প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েছিল।

এই দুর্গের আর একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে এর সবগুলি সৌধতে বাইরে থেকে সর্বদা প্রবহমান জল চালানোর ব্যবস্থা ছিল। একটা খাল, যাকে *নহর-ই বিহিস্ত* বলা হত, দিয়ে জল ঢুকত প্রাসাদের মধ্যে *শাহ বুরুজে*, যেটি ছিল উত্তর-পূর্ব কোণে। এর ফলে বাগানের মধ্যে ফোয়ারা, জলপ্রপাত, জলাধার এবং বিশাল *হাম্মামের* মধ্যে সর্বদা জল থাকত। এই সদা প্রবহমান জলের একটা উদ্দেশ্য ছিল যে প্রাসাদের মধ্যেকার সবগুলি নালী দিয়ে সব ঘরের মাঝখান দিয়ে জল যাতে যায়। *রংমহলের* মধ্যেও একটা নীচু জলাধার করে তার জল দিয়ে ফোয়ারা তৈরি করা হয়েছিল মার্বেল পাথরের। এই জলাধারটি ছিল মার্বেল পাথরের। প্রত্যেকটি পাঁপড়ি এমনভাবে করা হয়েছিল যেন সেগুলি বাতাসে দুলছে।

দেওয়ান-ই আম ছিল রাজকার্য সম্পাদন করার জায়গা এবং মার্বেল প্রাসাদের মত বিলাসবহুল নয়। এই হলঘর, লম্বায় ১৮৫ ফুট ও চওড়ায় ৭০ ফুট, একটা বড় চৌকো উঠানের মধ্যে, যার পূর্বদিকে স্তম্ভ। এর চারপাশের সৌধগুলি এখন আর নেই। এর সামনেটা নয় খিলানের তোরণশ্রেণীর মত এবং প্রতিটি খিলানের মধ্যে দুটি স্তম্ভ রয়েছে। কোণাতে চার খিলানের গোষ্ঠী। সমস্ত সৌধটাই বালুপাথরে করা, কিন্তু মনে হয় এর উপর শঙ্খের পলেস্তারা ছিল, যার সঙ্গে হাতির দাঁতের গুঁড়ো মিশিয়ে একে মসৃণ করা হয়েছিল।

Scanned with CamScanner

এই হলঘরের পিছনের দিকের দেয়ালে একটা বড় ও উঁচু কুঠুরির মধ্যে সম্রাট বসতেন সিংহাসনের উপর। এই সিংহাসনের পিছনের দেয়ালে *পিয়েত্রাদুরা* দেখা যায়। নানারকমভাবে দেয়ালটি চিত্রিত করা হয়েছিল যার মধ্যে ছিল "অরফিয়ুস ও তার বাঁশী"। এটি ছাড়াও আরো কয়েকটি নিদর্শন পাওয়া যায় ফ্লোরেন্টাইন পাথর বসানোর পরম্পরার। এই ধরনের ইউরোপীয় প্রভাব *রংমহলের* নিচারের দাঁড়িপাল্লার পাথরের পর্দার মধ্যে এবং শাহজাহানের ঘরের ছাদে (আগ্রা) অর্ধ-গোলাকৃতিভাবে নানা ধরনের লতাপাতার চিত্রের মধ্যে দেখা যায়। শেষেরটি ফরাসী দেশের রাজা ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ লুই-এর কাজের মত।

দুর্গ-প্রাসাদের বাইরে উঁচু টিলার উপর শাহজাহান *জামা মসজিদ* তৈরি করেছিলেন যেটি সম্ভবত সাম্রাজের সব থেকে বড় মসজিদ। লাল বালুপাথরে সমকোণী চতুর্ভুজ এই মসজিদের এক এক পাশ ছিল ৩২৫ ফুট। এর বাইরের দেয়ালে অনেকখানি জায়গায় কালো ও সাদা মার্বেল পাথর লাগানো হয়েছিল। উঠানের অন্য তিন দিকে ছোট ছোট কুঠুরি লম্বা স্তম্ভের সঙ্গে। এর মাঝখানে ছিল ভিতরে ঢোকার দরজা। প্রায় সবটা জায়গাই খোলা, কেবল মাঝে একটা চৌকো জলাধার রয়েছে। মসজিদের ভিতরটি ২০০ ফুট চওড়া ও ৯০ ফুট গভীর। এর বাইরে একটা বিশাল খিলান যুক্ত দরজা রয়েছে যার পাশে দশটি খিলানযুক্ত তোরণ (এক একদিকে পাঁচটি)। বিশাল একটা মিনার চারটি স্তরে ভাগ হয়ে উঠে গিয়েছে এবং সব কিছুর উপরে রয়েছে তিনটি বিশাল আকারের সাদা মার্বেল পাথর দিয়ে তৈরি ফুলানো গম্বুজ। ভিতরের হলঘরটি বিভিন্নভাগে বিভক্ত হয়ে আছে বিশাল দেয়ালের ভিতের গাঁথনীর উপর যেগুলিতে রয়েছে অলঙ্কৃত খিলান। প্রতিটি ভাগের পশ্চিমে খিলানের ভিতরে রয়েছে *মিহরাব*। দেয়ালে লতাপাতার অলঙ্কার করা আছে।

১৬৪৮ সালে শাহজাহান তাঁর মেয়ে জাহানারা বেগমের সম্মানে আগ্রাতে একটা *জামা মসজিদ* তৈরি করে দেন। দিল্লির মসজিদের থেকে এটি অনেক ছোট। এটি লম্বায় ছিল ১৩০ ফুট ও চওড়ায় ১০০ ফুট। এর তিনটে গম্বুজের উচ্চতাও ছিল ছোট এবং এর খিলানগুলি ছিল সাধারণ "টিউডর" জাতীয়, যার মধ্যে লতাপাতা ছিল না। এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে এর সামনে খিলানগুলি নিয়মিত ব্যবধানে ছড়িয়ে আছে এবং ছত্রীগুলির সঙ্গে এক বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেছে যার মধ্যে আনন্দদায়ক সুষমা রয়েছে। এটা জানা যায় যে এই মসজিদ তৈরি করার জন্য কাঠের খাঁচা করা হয়েছিল এবং শেষ হলে আগ্রার অধিবাসীদের মধ্যে ঐ কাঠগুলি বিতরণ করে দেওয়া হয়।

শাহজাহানের সময়ে যখন পাথর ও মার্বেলের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে সৌধ করা হচ্ছে তখন লাহোর ও পাঞ্জাবে আর এক ধরনের স্থাপত্য গড়ে উঠতে থাকে। এগুলি প্রধানত ইঁটের কিন্তু এর সঙ্গে মাঝে মাঝে মেশানো হত বালুপাথর। উল্লেখযোগ্য যে এর সঙ্গে ব্যবহার করা হত উজ্জ্বল টালী যেটি সম্ভবত পারসীক কলাকৌশলের সাহায্যে করা হচ্ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ারদিকে পারসীক সম্রাট তাঁর রাজধানী ইস্পাহানে যে ইঁটের বাড়িগুলি করেন তার প্রভাব লাহোর ও পাঞ্জাবে পড়েছিল বলে ধরা হয়, যদিও সুলতানী বাংলায় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ থেকেই ইঁট ও উজ্জ্বল টালীর ব্যবহারের প্রচুর নিদর্শন পাওয়া যায়।

Scanned with CamScanner

১৬৩৪ সালে নির্মিত লাহোরে ওয়াজির খানের মসজিদ এই ধাঁচে নির্মিত। কিন্তু এই শহরের আশেপাশে অন্যান্য সৌধও এইভাবে নির্মিত হয়েছিল। আগ্রাতেও এই ধরনের সৌধ দেখা যায় যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য আফজল খানের সমাধি, যেটিকে "চিনি কা রোজা" বলে বলা হয়। কিন্তু ওয়াজির খানের মসজিদেই এই ধাঁচের সৌধ তার পূর্ণ ক্ষমতা নিয়ে আসে। এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে এর প্রত্যেকটি অংশই বিভিন্ন রং-এর সংমিশ্রণে ও উজ্জ্বল টালীর সাহায্যে একটা বিশেষ চেহারা নিয়েছে।

এইসব স্থাপত্যশিল্পের মধ্য দিয়ে পরীক্ষা নীরিক্ষা চলেছিল, তার চরম উৎকর্ষ ছিল *তাজমহল*। কেউ কেউ বলেছেন যে এখানে আগে একটি হিন্দুমন্দির ছিল যেটি ভেঙে এই সমাধি সৌধটি করা হয়েছে। *তাজমহল* শাহজাহানের স্ত্রী মমতাজ মহলের সমাধিসৌধ। বিবাহের আগে ওঁর নাম ছিল আরজুমন্দ বানু বেগম। শাহজাহানের সঙ্গে বিবাহ হয় ৩০শে এপ্রিল ১৬১২ সালে। বিবাহের পরে নাম হয় মমতাজ মহল। ওঁর মৃত্যু হয় বুরহানপুরে ৭ই জুন ১৬৩১ সালে। ১লা ডিসেম্বর ১৬৩১ সালে মৃতদেহ আগ্রাতে নিয়ে আসা হয়। আগ্রা শহরের দক্ষিণ দিকে যমুনা নদীর পাড়ে রাজা মান সিংহের একটি জমি ও বাড়ি ছিল। তখন এর মালিক ছিলেন মান সিংহের নাতি রাজা জয় সিংহ। শাহজাহান এঁর কাছ থেকে ঐ বাড়িশুদ্ধ জমি কিনে নেন এবং পরিবর্তে শহরে চারটি বাড়ি দেন। ১৬৩১ সালের ডিসেম্বরে কাজ শুরু হয় যার সাক্ষী ছিলেন ফরাসী পর্যটক তাভারনিয়ার। শাহজাহানের *ফারমান* থেকে দেখা যাচ্ছে যে রাজস্থানের মাকরাণা থেকে মার্বেল পাথর আসছে। মৃতদেহ ঐ জমির উত্তর-পশ্চিম কোণে একটা ছোট সৌধের মধ্যে সাময়িকভাবে রাখা হয়েছিল। ১৬৪৩ সালে *তাজমহল* তৈরি শেষ হলে মৃতদেহ আনা হয়। সমাধির কাছে যাবার আগে জ্যাসপার পাথরের একটা দরজা ছিল, যা এখন আর নেই।

পাদ্রী সেবাস্টিয়ান মানরিক দাবি করেছেন যে এই সৌধের প্রধান বাস্তুকার ছিলেন ইতালীয় শিল্পী, যিনি মুঘল দরবারে কাজ করতেন, জেরোলিমো ভেরোনিও। এর কোন ভিত্তি নেই। এর প্রধান বাস্তুকার ছিলেন ওস্তাদ হামিদ যিনি দিল্লির লালকেল্লার বাস্তুকার ছিলেন। ওঁর ছেলের লেখায় এই তথ্য পাওয়া যায়।

কেউ কেউ বলছেন যে পঞ্চাশ বছর আগে দুটি সমাধিসৌধ *তাজমহলের* স্থাপত্যকে প্রভাবিত করেছিল। একটি হচ্ছে হুমায়ুনের সমাধি ও অন্যটি দিল্লির খান-ই খানানের সমাধিসৌধ। শেষেরজন মারা যান ১৬২৭ সালে। এটা মেনে নিলে বলা যায় যে পঞ্চাশ বছর আগেকার প্রায় পরিত্যক্ত শৈলী *তাজমহলের* মধ্য দিয়ে আবার ফিরে আসছে।

মমতাজ মহলের সমাধির জন্যে তৈরি হলেও, এর প্রধান অংশটি অল্প জায়গা নিয়েছিল। উত্তর থেকে দক্ষিণ অভিমুখী সমকোণী চতুর্ভুজ এই সৌধটি ১৯০০ ফুট লম্বা ও ১০০০ ফুট চওড়া। প্রধান এলাকা হাজার ফুট চওড়া বাগান দিয়ে ভাগ করা হয়েছিল। এর দক্ষিণ দিকটা রাখা হয়েছিল কাজের লোকেদের বাসস্থান ইত্যাদির জন্য। এর মধ্যে রাস্তাও ছিল এবং উত্তর দিকে ছিল সৌধটি নদীর পাড়ের উঁচু জমিতে। বাগান সমেত সৌধটি ঘেরা

Scanned with CamScanner

হয়েছিল এক বিশাল পাঁচিলের দ্বারা। উত্তর দিকে নদীর পাড়ে একটা উঁচু মার্বেল পাথরের চাতাল করে তার উপর সমাধি ও অন্য কয়েকটি সৌধ বানানো হয়েছিল। দক্ষিণ দিকে পাঁচিলের মাঝখানে করা হয়েছিল বিশাল একটা দরজা। পাঁচিলের প্রতি কোণায় অষ্ট-কোণাকৃতি বড় ছত্রী বসানো হয়েছিল। দরজার বাইরে ছিল চত্বর যার এপাশে ছিল আস্তাবল, অন্যান্য বাড়ি এবং বাজার। মুঘলদের স্থাপত্যশিল্পে পরবর্তীকালে কিছু জোড়া লেগেছে বা বদলানো সম্ভব ছিল না বলে নিখুঁত ও সম্পূর্ণ পরিকল্পনা প্রথমেই করে নেওয়া হয়েছিল।

তাজমহলের ভিতরের ব্যবস্থা হুমায়ুনের সমাধিসৌধের থেকে নেওয়া হয়েছিল বলে বোধ হয়। এখানেও প্রধান হলঘরটি হচ্ছে অষ্টকোণ। যার প্রতি কোণায় একটা ছোট ঘর আছে এবং যেখান থেকে সূর্যের রশ্মির মত লম্বা বারান্দা প্রধান হলঘরে পৌঁছেছে। প্রধান হলটি হুমায়ুনের সমাধির মত ঢাকা দোতালা যার উপরে একটা অর্ধ-গোলাকৃতি খিলান দুটি গম্বুজের ভিতরের খোলস হিসাবে রয়েছে। নীচে যতটা ফাঁক আছে উপরের খিলানে ততটাই জায়গা ফাঁকা রয়েছে। অন্যান্য ঘরগুলি সাদাসিধা এবং ঐ একই ধরনের ফাঁকা— অর্থাৎ উপরের খিলানের ফাঁকা জায়গা আর নীচের ফাঁকা জায়গা সমান। সমাধির চতুষ্কোণের চারপাশে জাফরীকাটা পাথরের পর্দা রয়েছে, যদিও নানারকম পাথর বসানো এবং নানারকম ভাস্কর্য্য রয়েছে। কিন্তু এগুলি হুমায়ুনের সমাধিসৌধের এই অংশের থেকে কম।

এই সমাধিসৌধের প্রধান বৈশিষ্ট্য অবশ্য এর বাইরের চেহারার অসাধারণ সুষমা এবং সংগঠন। এর কারণ বিভিন্ন অংশের মধ্যে অতিমাত্রায় সঙ্গতি এবং প্রতিটি অংশের লীলাময় ছন্দ। যে ধরনের মার্বেল পাথর ব্যবহার করা হয়েছিল তার অসাধারণ নিখুঁত মসৃণতা এবং তার সঠিক ব্যবহার এর একটা বিশেষ আকর্ষণ। মাকরাণার এই মার্বেল পাথরের বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে যে সেটি বিশেষ মুহূর্তের আলো ধরে রেখে একটা বিশেষ স্বরভঙ্গী গড়ে তুলতে পারে। কখনো কখনো ছায়ায় এটা একটা মৃদু ও অপার্থিব চেহারা নিয়ে নেয় যার ফলে দিনের প্রতিটি ঘণ্টায় ও প্রতি বায়ুমণ্ডলের সঙ্গে সঙ্গে তাজমহল একটা বিশেষ রং নিয়ে নেয়। চাঁদনী রাতে মনে হয় যে গম্বুজটি তারাদের মধ্যে আকাশে ভাসছে। এমনকি গোধূলী লগ্নে এর চেহারা হয়ে যায় একটা নিঃসঙ্গ শুকনো গোলাপের মত।

এর বিপরীতদিকে যমুনার পাড়ে শাহজাহান চেয়েছিলেন কালো মার্বেল পাথরে এর জুড়ি তৈরি করতে। একটা সাঁকো দিয়ে এ দুটি লাগিয়ে দেবেন বলে ভেবেছিলেন। ফরাসী পর্যটক বলছেন যে শাহজাহান বিপরীতদিকে তাঁর সমাধিসৌধ তৈরি করা শুরু করেছিলেন। কিন্তু গৃহযুদ্ধের ফলে তা করতে পারেন নি। সম্রাট আওরঙ্গজেব এটি করতে উৎসাহ দেননি। তাজমহলের মধ্যে রাণীর সমাধির একপাশে সম্রাটের সমাধির অবস্থান থেকে মনে হয় যে ঐ স্থান নির্বাচন পরবর্তীকালে করা হয়েছিল কারণ ওঁর আলাদা সমাধিসৌধ করা হয়নি।

আওরঙ্গজেব

মুঘল সাম্রাজ্যের পতন শুরু হবার সময় যদি আওরঙ্গজেবের সিংহাসনে আরোহণের কিছু সময় পর থেকে ধরা যায়, তাহলে ঐ একই সময় থেকে মুঘল স্থাপত্য শিল্পের পতন শুরু

Scanned with CamScanner

হয়েছিল বলা যেতে পারে। এটা এখন পরিষ্কার যে মুঘল স্থাপত্য অনেকাংশে দরবারী উৎসাহের উপর নির্ভরশীল ছিল এবং তার চেহারা ও ছন্দ নির্ভর করত শাসকের মর্জির উপর। আওরঙ্গজেবের শাসনকালে যেসব সৌধ করা হয়েছিল তার মধ্যে সম্রাটের রাষ্ট্র ও সমাজ সম্বন্ধে ধারণার পরিচয় পাওয়া যায়। এর মধ্যে তাঁর দুর্বলতা ও কারুর কারুর মতে অন্ধ আদর্শবাদ ফুটে উঠেছিল। অন্যদিকে ঐ দুর্বলতাগুলি সমসাময়িক রাজনৈতিক দুর্বলতার প্রতিফলন যেখানে শাসকের নিয়ন্ত্রণ ক্রমশ কমতে থাকে।

যে-কোন কারণেই হোক, ব্যক্তিগত বা রাজনৈতিক, সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দিকে মুঘল স্থাপত্য শিল্পের মানও যেমন কমতে থাকে, তেমনি সংখ্যাও কমতে থাকে। এই পরিবর্তন দাক্ষিণাত্যে দেখতে পাওয়া যায় যেখানে আওরঙ্গজেবে তার শেষ বিশ বছর কাটিয়েছিলেন। ওঁর থাকার সময়ে আওরঙ্গাবাদকে উনি রাজধানী করেন যেখানে একটা দুর্গ ও অন্যান্য সৌধ তৈরি করেছিলেন। ১৬৭৪ সালে তৈরি আওরঙ্গজেবের স্ত্রী রাবিস দৌরানীর সমাধিসৌধ দেখা যায়। ওঁর ছেলে তৈরি করলেও, এটির পরিকল্পনা ছিল *তাজমহলের* মত। যদিও *তাজের* থেকে আয়তনে এটি ছিল অর্ধেক। কিন্তু এর মধ্যবর্তী হলঘরের উপরে গম্বুজ, চারটি মিনার, বাগানের মধ্যে বসানো—সবই *তাজমহলের* অনুকরণে করা। এই দুটি সৌধের তুলনা করলেই প্রায় তিরিশ বছরের মধ্যে কী অভূতপূর্ব পরিবর্তন, যা পতনের দিকে যাচ্ছিল, দেখতে পাওয়া যায়। *তাজমহলের* যে এটা একটা হাস্যকর অনুকরণ সেটা বুঝতে অসুবিধা হয় না। ছোট করে করার জন্য এর উপরিভাগ চেপে রাখা হয়েছে যার ফলে ছত্রীও শিখরগুলির বিকাশ হয়নি। এছাড়া এর অলঙ্কারগুলিও অতি সাধারণ। ছোট ও বড় গম্বুজগুলির মধ্যে সাবলীলতা নেই এবং অত্যন্ত বেশি দৃঢ় ও আনুষ্ঠানিক। কেবলমাত্র এর মিনারগুলি সাদাসিধা হলেও এদের একটা পারস্পরিক সঙ্গতি রয়েছে। *তাজমহলের* মধ্যে যে মানসিকতা ছিল এখানে সেটি অদৃশ্য—ফলে এটি কেবলমাত্র একটি সৌধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

আওরঙ্গজেবের এক অভিজাত আমলা ১৬৭৪ সালে লাহোরে একটা বড় মসজিদ তৈরি করান। মসজিদ তৈরি করার পরম্পরার মধ্যে থেকেও, এটি করা হয়েছিল অত্যন্ত সুদৃঢ়। এর মধ্যে সাধারণের থেকে বেশি মিনার দেওয়া হয়েছিল (মোট আটটি), কিন্তু একটা ভূমিকম্পের ফলে এর বহু অংশ ধ্বংস হয়ে যায়। এটি দিল্লির *জামা মসজিদের* থেকে ছোট হলেও, ওর পরিকল্পনানুযায়ী এটি তৈরি করা হয়েছিল। এর সামনে ছিল বিশাল মধ্যবর্তী ঘর দুই পাশে পাঁচটি খিলান লাগানো। অষ্টকোণাকৃতি মিনার ছিল শেষে এবং সব কিছুর উপরে তিনটি ফোটানো গম্বুজ উঠেছিল। এর সৌন্দর্য অনেকখানি নির্ভরশীল ছিল তিনটি ফোটানো গম্বুজের উপরে। ক্রমশ এই গম্বুজগুলির নীচের অংশটি ছোট হয়ে আসছিল যার ফলে উপরে বসানো ফোটানো গম্বুজ আরো বেশি স্পষ্ট হয়ে আসে। দিল্লির হুমায়ুনের সমাধিসৌধ থেকে দেখলে এটি স্পষ্ট হয়। *তাজমহলের* গম্বুজের নীচুর অংশটি ছোট হলেও ক্রমশ ফিরে যাচ্ছিল ড্রামের কাছে, যার ফলে গম্বুজটি আরো বেশি ফোলানো

Scanned with CamScanner

দেখা যায়। দিল্লির *জামা মসজিদ* ও লাহোরের *বাদশাহী মসজিদে* এটা আরো বেশি করা হয়েছিল। একমাত্র *তাজমহলেই* ছিল নিখুত মধ্যবর্তী পন্থা।

গম্বুজ নিয়ে পরিষ্কার কোন ধারণা যে আসেনি সেটা বোঝা যায় দিল্লি দুর্গের মধ্যে আওরঙ্গজেবের তৈরি *মোতি মসজিদ* থেকে। এর মধ্যে তিনটি ছোট ছত্রী ব্যবহার করা হয়েছিল। শাহজাহান দুর্গের মধ্যে কোন মসজিদ করেন নি, কিন্তু আওরঙ্গজেব অন্য ধরনের লোক ছিলেন। উনি দিনে বা রাত্রে মসজিদে যাবার জন্য দুর্গের মধ্যে মসজিদ তৈরি করার আদেশ দেন এবং রাজার বাসস্থানের কাছেই এটি করা হয়েছিল। এটি মসৃণ মার্বেল পাথরের সৌধ এবং এর বাঁকগুলিও সংযত যার ফলে এর সৌন্দর্য কমেনি। কিন্তু তিনটি ছত্রী লাগানোর ফলে সমসাময়িক গম্বুজগুলির বৈশিষ্ট্যও হারিয়েছিল।

আওরঙ্গজেবের আরো কয়েকটি স্থাপত্যকীর্তি উত্তরভারতের বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে আছে। এর মধ্যে রয়েছে বারাণসীর মসজিদ যার কোন বৈশিষ্ট্য নেই ও মথুরার *জামা মসজিদ*। শেষেরটি ওয়াজির খানের সমাধির ইঁট ও টালীর ধাঁচের সঙ্গে পুরানো ঘরানার সংমিশ্রণ। দোতলা এই সৌধে নানারঙের টালী বসিয়ে ও বারকোণা মিনার তুলে এর সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা হয়েছিল।

১৭০৭ সালে আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মুঘল স্থাপত্যশিল্প বিপর্যয়ের সামনে পড়ে। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে অযোধ্যার নবাবরা ক্ষমতা পেয়ে স্থাপত্যশিল্পকে উৎসাহ দিয়ে নূতন ঘরানার সৃষ্টি করেন। দিল্লিতে শেষ মুঘল স্থাপত্যের নিদর্শন দেখা যায় ১৭৫৪ সালে তৈরি নবাব সফদরজং (অযোধ্যার নবাবের ভ্রাতুষ্পুত্র)-এর সমাধি। প্রায় দুশো বছর আগে হুমায়ুনের সমাধির সঙ্গে তুলনা করলে মুঘল স্থাপত্যশিল্পের পতন সহজেই চোখে পড়ে, যদিও সমসাময়িক রাজনৈতিক পটভূমিকায় সফদরজং-এর সমাধিসৌধ প্রায় বিস্ময়কর।

Scanned with CamScanner